অন্য শিল্পী, অন্য মানুষ ঃ সাধন সরকার

--নাজিম মাহমুদ

ভিয়েৎনাম তখন সাম্রাজ্যবাদী বর্বর হামলা প্রতিহত করছে। একটি ছোট্ট দেশ এক পরাশক্তির মুখোমুখি। রক্তস্নাত, তবুও মুক্তিপাগল সে দেশের এই জনযুদ্ধে উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ। ওই সময় খুলনার এক সংগঠন (সন্দীপন) স্থির করলো ভিয়েৎনামের মুক্তিকামী জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষনার উদ্দেশ্যে এক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করতে হবে। সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য নতুন গান লেখার দায়িত্ব পড়লো কয়েকজনের উপর। একটি নির্দিষ্ট দিনক্ষণের মধ্যে পাওয়া গেল সব রচনা। সঙ্গীতানুষ্ঠানের মহড়া শুরু হবার ঘন্টাখানেক আগে এলেন সুরকার ও পরিচালক সাধন সরকার। গোটা দশবারো গানের বাণী এক সাথে হারমোনিয়ামের উপর বিছিয়ে তিনি বসলেন। এক একটি গানের বাণীর উপর এক এক রকম সুর ছড়াতে লাগলেন। আমি পাশে নির্বাক, তাঁর মুখে তাকিয়ে আছি। কোনো সুরই তিনি কণ্ঠে তুলছেন না। শুধু একবার একরকম, আবার অন্যরকম- এভাবে উদারা-মুদারা-তারায় উঠা-নামা করে মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন- 'কোনটি রাখবে বলো? কোনটি ভালো লাগছে?' তাৎক্ষণিক ভাবে এ প্রশ্নের উত্তর কি কঠিন, তা আমি জানি। কেননা যেমনই সুর তিনি বাজান, আমার তাই ভালো লাগে। এভাবে চলতে চলতে এক সময় সর্বশেষ গানটিরও সুরারোপ হয়ে গেল, তবে সে সুর তখনও তাঁর মনে মনে। ইতিমধ্যে একে একে কণ্ঠশিল্পীরা সেখানে আসতে শুরু করেছে। তারা হয়তো ভাবতেই পারছেন না সাধন দা হারমোনিয়ামের পর্দায় আঙুল চালিয়ে কি ঠোকাঠুকি করছেন। এক সময় খুলনার আঞ্চলিক উচ্চারণে সাধন দা'র ভারী গলা শোনা যায়--
'সবাই আইসে পড়িছো। নাও, শুরু করো।' উনি গাইতে শুরু করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই গান এক ডজন ছেলেমেয়ের কণ্ঠে উঠে গেল।

এ ভাবেই এক একটি গানের জন্ম হতে লাগলো। প্রথম দিন দেড় ঘন্টার মহড়ায় দশটি গান মুক্তি পেল। কি বিস্ময়কর সেই দ্রুত সুরারোপ। আজো অবাক হয়ে ভাবি, কোন সুরকার কি সুর রচনায় এমন বৈচিত্র্য এত সহজে এত কম সময়ে আনতে পারেন! শুধু তাই না। সংগঠনের এই সব ফরমাশী গণসঙ্গীতে সুর দেবার সময় নবীন শিল্পীদের কণ্ঠের ধারণ ক্ষমতার কথাও তিনি মনে রাখতেন। সুর রচনায় জটিলতা এড়াতেন, পাছে কোনো শিল্পীর অসুবিধা হয়। তাই বলে সুরের চমৎকারিত্ব কোথাও ছুটে যেতেও দিতেন না তিনি। এই অসামান্য ক্ষমতা ক'জন পায়। আর যিনি পান, তিনি কি স্বদেশে প্রায় অখ্যাত ও অবজ্ঞাত হয়ে জীবন কাটিয়ে যেতে পারেন?

আমি এতক্ষণ একদিনের অভিজ্ঞতার কথাই বললাম। সাধন দা'র জীবনে এ রকম 'একদিন' বেশুমার। বন্ধু-স্বজন-অনুরাগী যে কেউ তাঁকে গান দিলেই এবং সেই গান তাঁর মোটামুটি পছন্দ হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সে গানে সুর লাগিয়ে দিতেন। এমন অনায়াসে সে কাজটি তিনি করতেন যেন এটা কোনো ব্যাপারই নয়। গান পছন্দ না হলে অবশ্য রচয়িতার মুখের উপরই বলে দিতেন- 'নাহ, তেমন যুৎ হয়নি; ভালো করে লিখে আনেন'। গান লেখায় একটু আধটু যাঁরাই আগ্রহী, তাঁদের গানে সুরারোপ করে উৎসাহিত করতেন তিনি। গণসঙ্গীত হোক আর আধুনিক প্রেমের গানই হোক- যুৎসই সুর সংযোজনে তিনি যে কতখানি পারঙ্গম ছিলেন, তার সবটা কেউ আর জানলো না। এই না জানার কারণ তাঁর প্রচারবিমুখতা। যে সব মাধ্যম একজনকে জনসমুখে তুলে ধলে, সেখান থেকে সহস্রযোজন দূরে ছিল তাঁর অবস্থান। সন্দীপন নামে যে প্রতিষ্ঠানে এক সময়ে তাঁর প্রতিভা স্ফুরিত হয়েছে, সেখানে তিনি ছিলেন প্রাণ পুরুষ। এ কথাটি এভাবেও বলা যায় যে এই সংগঠনে আমরা অনেকে মাটি সংগ্রহ করে এনেছি, হাসান আজিজুল হক সে মাটিতে মূর্তি গড়েছেন, খালেদ রশীদ সেই মূর্তির চক্ষুদান করেছেন এবং সেই নির্মাণে সাধন দা করেছেন প্রাণ সঞ্চার।

শুধু সন্দীপনই নয়, আরো অনেক সংগঠনই সাধন দা'র প্রাণের ছোঁয়ায় সঞ্জীবিত হয়েছে। প্রগতিশীল কোনো সংগঠনের ডাক তিনি কখনো ফিরিয়ে দেননি। অর্থাৎ প্রগতিশীল যে কোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবান করতে তাঁর যে কর্মকান্ড, তা ছিল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বআরোপিত এক কর্তব্য। সঙ্গীত শিক্ষা দান তাঁর জীবিকা হলেও সংস্কৃতি চর্চা তাঁর জীবিকা কিংবা ফ্যাশন ছিল না। তাঁর জীবন ও আদর্শের সাথে এক ও অভিন্ন হয়ে মিশে ছিল তাঁর এই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। জীবনের কি নিদারুণ বৈরী বাতাস ঠেলে তাঁকে সারা জীবন এক পা এক পা চলতে হয়েছে, তাঁর বন্ধু মাত্রই সে কথা অবগত। অথচ ম্যাট্রিক পাশ করে যে সময়ে তিনি বিধাব মা'কে নিয়ে সংসারের হাল ধরেছেন, তখন একটি চাকরী জুটিয়ে নেওয়া তাঁর জন্য কঠিন ছিল না। ওই সময়ে কোর্ট-কাচারী, সিভিল সাপ্লাই, লাইসেন্স প্রদানকারী যে কোন অফিসের কনিষ্ঠ কেরানীও অল্পদিনে ফেঁপেফুলে কলাগাছ হয়ে যেতো। সাধন দা চাকরীর কথা একবারও ভাবেননি। এমন কি সঙ্গীতচর্চা শুরু করে কিছুদিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকসহ বড় বড় আমলাদের শ্রদ্ধাভাজন হলেও তিনি কোনো সুবিধা পাবার চেষ্টা করেন নি তাঁদের কাছে।

কোনো কোনো মানুষ আছেন, যিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ নিয়েই বোধহয় ভূমিষ্ঠ হন। এই রকম মানুষের যে কোনো বয়সই মনে করতে চেষ্টা করলেই তাঁর চেহারা ভেসে ওঠে। সাধন দা ছিলেন তেমনই একজন। তিনি বয়সে আমার ছোটো কি বড়, সে হিসাব মেলাবার আগেই সেই টিন এজ-এ তাঁকে 'দাদা' ডেকে ফেলেছি। পরবর্তীকালে কত কাছের মানুষ হয়ে গেলাম পরস্পর, কত সৃষ্টিতে একাত্ম

ও অভিন্ন হয়ে রইলাম দুজনে; কিন্তু সেই 'সাধন দা' ও 'আপনি' ডাক আমার জিবের ডগা থেকে খসতে পারেনি। তিনি যেমন শুরুতেই আমার নাম ধরে 'তুমি' বলতেন, তাই বলে গেলেন চিরকাল।

আমার স্কুল জীবনের শেষ পর্যায়ে চাঁদ'র (নন্দিত অভিনেতা 'মুস্তাফা') সাথে যোগাযোগ হবার পর আমি অগ্রণী শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে অংশ নিতে শুরু করি। এই সংগঠনেই আমি প্রথম সাধন দা'কে পাই। কোনো এক বিকেলে মহড়া ছিল বি. কে. স্কুলের একটি কক্ষে। সাধন দা তখন বেশ গোলগাল নাদুশনুদুশ উজ্জ্বলবর্ণ। সকলের অনুরোধে হারমোনিয়াম টেনে একটি গান শোনালেন তিনি। কার লেখা জানিনা। তখন রওশন ভাই (পরবর্তীকালে স্কুল শিক্ষক) সাধারণতঃ তাঁকে গানের বাণীর যোগান দিতেন। সেই গান সুরে চড়াতেন সাধন দা। সেদিন আমাদের যে গানটি তিনি শোনালেন, সেটি বর্ষার গান বলেই মিয়া কি মল্লার রাগের পর্দা সেখানে কিছুটা মুহূর্তে সকল শ্রোতার মনে সেই সুর ঢেউ তোলে। তখনও সাধন দা সঙ্গীত শিক্ষা দান জীবিকা বলে গ্রহণ করেন নি। তাঁর প্রথম গুরু ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দিন খুলনা ছেড়ে চলে যাওয়ায় কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তখন তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পাঠ নিচ্ছেন। মুনশী সাহেবকে বেশিদিন পাননি সাধন দা। আবার কালিদাস বাবু যে তালিম দেবার বেলায় তার প্রতি খুব অকৃপণ ছিলেন, তা নয়। সাধন দা'র প্রতিবেশী পূর্ণেন্দু দালাল (এস্রাজবাদক, শিক্ষক) ও বিনয় রায় (সেতার বাদক, স্বর্ণকার) এই গুরুর কাছে যতোটা প্রশ্রয় পেতেন, সাধন দা তা পাননি। সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধন দা'র দারিদ্র্যই ছিল বড় অন্তরায়। অবশেষে এক বন্ধুর মাধ্যমে ভাতখন্ড সংগ্রহ করে তাঁকে সঙ্গীত শিক্ষায় স্বনির্ভর হতে হয়েছে।

সুরের ভুবনে সাধনদা'র প্রবেশ প্রায় ঘটনাচক্রে। দেশভাগ হয়ে গেল। ফুটবল-ব্যাডমিন্টন-ক্যারাম খেলার বন্ধুবান্ধব প্রায় সবাই চলে গেল দেশ ছেড়ে। বাবাও লোকান্তরে গেলেন অকালে। মির্জাপুর রোডের আড়াই কামরার পাকা পৈত্রিক বাড়িটিই সম্বল। বিধাব মাকে নিয়ে সংসার সমুদ্রে ভাসলেন সাধন দা। মেধাবী ছাত্র হলেও তাঁর পড়াশোনা চালানো আর সম্ভব নয়। বাড়িতে বাড়িতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে জীবন ধারণ শুরু হলো তাঁর। কিছুদিনের মধ্যে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে খুলনা শহরে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জনের পর সঙ্গীত শিক্ষাদানের আমন্ত্রণ পেলেন তিনি। কোনো চাকরী না করে ওই সময়ে শুধুমাত্র সঙ্গীতজ্ঞানের পুঁজি নিয়ে একটি মফস্বল শহরে টিকে থাকা যে কঠিন, তা সবাই অনুমান করতে পারেন। দ্রব্যমূল্য যেমন বেড়েছে, তেমনি বিধাব মা ও তাঁর একমাত্র পুত্রের সংসারে বধূর প্রবেশ ঘটেছে এবং ধীরে ধীরে এই সংসারও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধন দা'র পৈত্রিক বাসগৃহের পলেস্তরা কালের দাপটে খসে খসে পড়েছে। দীর্ঘকাল সেখানে সামান্যতম সংস্কার সম্ভব হয়নি। খুলনা শহরের প্রাণ কেন্দ্র জনবহুল আবাসিক এলাকার চারপাশে আলো ঝলমল রাজ্যে তাঁর গৃহে বিজলী বাতি জ্বলেনি বহুদিন। আক্ষরিক অর্থেই শুধুমাত্র মোটাচালের ভাত ও লবন খেয়েই এই সংসারে বেঁচে থেকেছে কয়েকটি প্রাণী। এ রকম অবস্থার মধ্যেও হাসিমুখে বিপুল উদ্যমে সাংস্কৃতিক সংগ্রামের পুরোভাগে পা ফেলে এগিয়ে গেছেন সাধন দা। এ রকম দুঃসহ জীবনেও তাঁর পুত্র এক কৃতী ছাত্র হয়েছে। আরাম আয়েশের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতাও সাধন দা'র ছিল না। সন্দীপনের সবাই যখন সেলিম হোটেলে সান্ধ্য আড্ডায় সামিল, সাদন দা সেখানে অনুপস্থিত। তাঁকে সেখানে কিছুতেই টেনে নেওয়া যায়নি। শামসুর রহমান রোড-আহসান আহমেদ রোডের ক্রসিং-এ দাদুর গোলপাতা ছাওয়া দোকানে বিকেলে এক কাপ চা-ই ছিল তাঁর পরম তৃপ্তি। দারিদ্র্য এক অহংকার ছিল তাঁর। তানসেন গুরু হরিদাস স্বামী যেমন দরবারমুখী হননি। সাধন দা'ও ছিলেন সহজাতভাবে প্রচার ও স্বাচ্ছন্দ্যবিমুখ। এমন গভীর ও কঠিন তাঁর শিল্পীর আত্মাভিমান যে কোথাও তিনি আপোষ করেন নি। অনেক বড় আমলা কিংবা হোমরা চোমরা ব্যক্তি তাঁর সাথে প্রথম আলাপে হোঁচট খেয়েছেন। এ রকম একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। তৎকালীন জেলা প্রশাসকের বাড়িতে শহরের ছোটোবড় সব শিল্পী সমবেত। জেলা প্রশাসক ও তাঁর স্ত্রী এক একজন শিল্পীকে ডাকছেন এবং তাঁর গান অথবা বাজনা শুনে অনুষ্ঠানে তাঁর অংশগ্রহণ অনুমোদন করছেন। এক সময়ে সাধন দা'র ডাক পরলো। তখন কতই বা তাঁর বয়স- অনুর্ধ্ব পঁচিশ। জেলা প্রশাসক জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি গান করেন?'
'সব রকম গানই গাইতে হয়' বললেন সাধন দা।
মানে?
'মানে গানের টিউশনি করে পেট চালাই। তাই ফরমাশ মতো সব রকম গানই গাইতে হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-'
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পী কম বলেই জেলা প্রশাসক তড়িঘড়ি বলে ওঠেন-
'তাহলে আপনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই শোনান।'
'কে শুনবে?' সাধন দা জিজ্ঞেস করলেন।
'কেন আমরাই শুনবো।' জেলা প্রশাসক তাঁর স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে কথাটি বললেন।
'আপনারা বুঝতে পারবেন তো আমি ঠিক গাইতে পারলাম কিনা, কেমন গাইলাম?' সাধন দা সোজাসুজি স্পষ্ট জানতে চাইলেন।
জেলা প্রশাসক এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, বললেন- 'মানে?'
সাধন দা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন- 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে জ্ঞান না থাকলে কিছুই কি বুঝতে পারবেন?'
এতক্ষণে জেলা প্রশাসকের বোধদয় হলো।

এই সংলাপ সামলে নিয়ে বুদ্ধিমান জেলা প্রশাসক বলে উঠলেন- 'ঠিক আছে এখানে আপনাকে গাইতে হবে না, অনুষ্ঠানেই গাইবেন আপনি।' জেলা প্রশাসক বাঙালি না হলেও এই ঘটনার পর সাধন দা'র গানের একজন অনুরাগী শ্রোতা ও তাঁর এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন।

আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। পুলিশের এক বড় কর্তার কন্যার সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হলেন সাধন দা। চুক্তি ছিল, সপ্তাহে দু'দিন এক ঘন্টা করে গান শেখাবেন। প্রথম দিনের পাঠ বুঝিয়ে দিতে আধঘন্টাও লাগলো না। সাধন দা যখন গান শিখিয়ে চলে যাচ্ছেন, সেই পুলিশ কর্তা ডাকলেন-
'মাষ্টার মশাই, শুনুন'
'বলুন'
'কথা ছিল এক ঘন্টা গান শেখাবেন? আজ প্রথম দিনেই দেখছি- আধঘন্টাও শেখালেন না।'
সাধন দা হেসে বললেন-
'তা ঠিক। প্রথম প্রথম আধঘন্টাও লাগবে না। তবে আপনার কন্যা যখন গান কিছুটা শিখে ফেলবে, তখন কিন্তু এক-দুই ঘন্টারও বেশী আমাকে থাকতে হবে। তখন কি ঘন্টা হিসেব করে বেশী টাকা আপনি দেবেন আমাকে?'

পুলিশ কর্তা আর কথা বাড়াননি। সাধন দা'র কথাও ঠিক ঠিক খেটে যায়। পুলিশ কর্তার কন্যা গানে এত ভালো হয়ে ওঠে যে সাধন দা ঘন্টার পর ঘন্টা তাকে তালিম দিয়েছেন। সুপাত্র পেলে ওস্তাদ যেমন আনন্দে তাঁর সম্পদ উজার করে দেন, এ ব্যাপার ছিল প্রায় সেই রকম। সম্পদশালী ব্যক্তির প্রতি সাধন দা'র কোনো ঈর্ষাবিদ্বেষ ছিল, তা মোটেই নয়। জাগতিক অর্থে যাকে সবাই সম্পদ কিংবা বৈভব বলে, তার প্রতি সাধণ দা'র কোনো আকর্ষণ ছিল না। এ রকম সম্পদশালীর কোনো মূল্যও ছিল না তাঁর কাছে। যে কোনো শ্রেণীর মানুষই হোক, তাঁর কোনো কুণ্ঠা ছিল না। বিশেষ করে সত্য গোপন করে সৌজন্য দেখিয়ে তথাকথিত ভদ্র গোবেচারী হবার কোনো চেষ্টাই তিনি করেন নি কখনও। মতামত প্রকাশে তিনি ছিলেন নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। সাধারণতঃ এমন মানুষ তাঁর পরিমন্ডলে জনপ্রিয়তা লাভ করেন না। এমন কাউকে তাঁর পরিচিত মানুষ এড়িয়ে চলারই কথা, কেননা পাছে কোন্ কথায় কি শুনতে হয়। কিন্তু সাধন দা'র ক্ষেত্রে তা হয়নি। দেশের সবাই তাঁকে না জানলেও তাঁর শহরবাসীর কাছে তিনি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় এক বিরল ব্যক্তিত্ব। নাগরিক সংবর্ধনা, পৌর সংবর্ধনা, এবং এ রকম বরণমালা তিনি অনেকবার পেয়েছেন। শুধু তাই নয়। খুলনা শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি যে মনোযোগ দিয়েছেন, তা কোথাও কেউ সাধারণতঃ পায় না।

সত্যি বলতে একুশ বছর হতে না হতেই সেই তরুণ বয়সেই সাধন দা চরিত্র বলে সকলের কাছে এক ধরণের শ্রদ্ধা পেতে শুরু করেন। কত স্থানে দেখেছি, শিল্পীদের আচরণ সম্পর্কে অনেকে সংশয়মুক্ত নন। হয়তো তার পিছনে কারনও থাকে। কিন্তু তরুণ শিক্ষক সাধন দা'কে তাঁর ছাত্রীরা যেমন ভয় পেতো, তা দেখে আমরা অনেকে কৌতুক বোধ করেছি। মাঝে মাঝে ভেবেছি, সাধন দা কি একেবারেই রসবোধ শূন্য, সুন্দর মুখও তাঁর মন টলায় না? আসলে তা মোটেই নয়। আমাদের আড্ডায় তিনি যখন কথক, যে কোন বিষয়ে তাঁর বর্ণনা ছিল দারুন রসাত্মক। তাই বলে কখনোই একটি অশালীন শব্দ কিংবা উপমা তাঁকে ব্যবহার করতে শুনিনি।

হ্যাঁ, কথকের কথা উঠতেই মনে পড়ে গেল- সাধন দা একজন ভালো লেখকও হতে পারতেন। বিশেষ করে দু একবার সন্দীপনের সৃজনশীলতার বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার জন্য হঠাৎ হঠাৎ গল্প লিখে তিনি আমাদের চমকে দিয়েছেন। গল্পের নামও অভিনব ঃ 'এক টিপ নস্যি', 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' ইত্যাদি। সন্দীপনের গল্পের যোগান দিয়ে তিনি বলতেন- 'কি করি, এভাবে সাপ্তাহিক আসর চলতে পারে না। তোমরা কেউ কিছু লিখছো না। এখন আমার গল্পের উপর আলোচনা করো।'

একেই বলে প্রতিভা। যা স্পর্শ করে তাই সজীব হয়। সত্যিকার অর্থে এক পরশপাথর ছিলেন তিনি। প্রতিবেশী বন্ধু পূর্ণেন্দু দালাল বড় লোক। তাঁর বাবা-কাকারা গ্রামোফোন ও রেকর্ডের ব্যবসায়ী। তিনি এস্রাজ কিনে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করতে পেরেছেন। এক বাঁশের বাঁশি কেনার সাধ্য ছিল সাধন দা'র। তাই কিনে সঙ্গীতচর্চার শুরু করলেন। পরবর্তীকালে কণ্ঠসাধনার জন্য অতি কষ্টে সংগ্রহ করলেন একটি ছোট হারমোনিয়াম। এই ছোট বহু পুরাতন মলিন যন্ত্রে কত আশ্চর্য সুর প্রথম বাজানো হয়েছে। বাঁশি, গীটার, তবলা সবই সাধন দা'কে বাজাতে হয়েছে জীবিকার প্রয়োজনে। কিন্তু যে যন্ত্রটির উপর তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল, তা হলো সেতার এবং তার জুয়ারি ধ্বনি। হয়ত তিনি ভাবতেন যখন কণ্ঠ কমজোর হয়ে যাবে, তখন এই সেতার বাজিয়ে সুরের ভুবনে তিনি ডুবে থাকতে পারবেন। আর যখন তিনি সেতার বাজাতেন এবং বিলম্বিত লয়ে চুইয়ে চুইয়ে সুর ফোটাতেন, তখন আমরা ভুলেই যেতাম এই মানুষটি মূলতঃ কণ্ঠশিল্পী এবং তাঁর কণ্ঠে বজ্র খেলা করে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-খেয়াল, ঠুমরী শোনাতে তিনি ভালোবাসতেন বটে, তবে এ সম্পর্কেও কিছু আদর্শ তিনি মেনে চলতেন। যেমন যে কোনো রাগের মূল সৌন্দর্য্যকে একটু একটু করে খুলে খুলে তিনি দেখাতেন। শুধুমাত্র বেশিক্ষণ গাইবার উদ্দেশ্যে অনুল্লেখ্য কোনো ওঠা-নামা দেখাতেন না। কালোয়াতি নয়, শ্রোতার বিরক্তি উৎপাদন নয়, রাগের সুন্দর রূপকে ফোটানোই ছিল তাঁর সাধনা। একবার শুধু কোম্পানীর প্রতিনিধিদের এক ঘরোয়া সমাবেশে সাধন দা'কে একজন ধরে বসলেন, 'হেমন্তর একটি গান শোনান।'

সাধন দা হেসে বললেন- 'হেমন্তর গান তো হেমন্ত গাইবে; আমি কেন?' প্রস্তাবক একটু লজ্জা পেলেন। সাধন দা তখন তার সংকোচ ঘোচাতে বললেন- 'ঠিক আছে, শোনাচ্ছি, তবে অন্য ভাবে, শুনুন।' এই বলে তিনি একটি বাংলা গানের কখনো মুখ, কখনো অন্তরা, কখনো সঞ্চারী গাইতে লাগলেন এবং কোন রাগের কোন পর্দা ভেঙ্গে ভেঙ্গে গাইতে গাইতে জিজ্ঞেস করলেন- একই রকম লাগছে কিনা। সবাই দারুন মজা পেল এরকম সুর ভাঙ্গার খেলায়। এমন করে সুরের ডিসেক্শন ক'জন করতে পারে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সবই তো দেখা যাচ্ছে একই ব্যাপার। অতএব, সমবেত সবাই তখন বললেন- 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই হোক সাদন দা, আপনার ইচ্ছে মতো।' ব্যাস, সাধন দা তন্ময় হয়ে গেলেন সুরে।

সুর রসায়নে সাধন দা'র মুন্সিয়ানা কি কম ছিল। সুর সংযোজনে বিভিন্ন রাগ তিনি ব্যবহার করতেন অনায়াসে। রাগ সঙ্গীতের মৌলিক রূপ ও রসকে আত্মস্থ করতে না পারলে এই কাজটি সম্ভব ছিল কি? উপমহাদেশের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ছাড়াও প্রবাসী বন্ধুদের পাঠানো স্টাফ নোটেশনে ধৃত বিদেশী সুরের বিশেষ বিশেষ অংশ তিনি গানে জুড়ে দিতেন। এ জন্যে স্টাফ নোটেশন থেকে সহজে সুর উদ্ধারের এক নিজস্ব পদ্ধতিও তিনি উদ্ভাবন করেন। বাংলা গানের স্বরলিপি পাঠ ও রচনায় তাঁর পারদর্শিতা সবাই জানতেন। খুলনা শহরে সঙ্গীতশিক্ষক মাত্রই সাধারণতঃ শিক্ষার্থীকে স্বরলিপি থেকে সুর তোলার কায়দাটি শিখিয়ে থাকেন। এই ধারার সূচনা করেছেন সাধন দা। কারণ স্বরলিপি নির্ভর হয়েই সাধন দা'কে সুর সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। ১৯৫০ খ্রিঃ-এর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। অমিত মিত্র (কলকাতা বেতার ও টিভি'র রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী, পুনেবাসী) তখন শান্তি নিকেতনের ছাত্র। একবার ছুটিতে স্বগৃহে খুলনায় এলো সে। ওই সময়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে অগ্রণী শিল্পী সংঘের এক আয়োজনে দু'একটি গান শেখাবার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হলো। এবং 'নাই নাই ভয় হবে হবে জয়' শেখাতে গিয়েই সাধন দা'র প্রশ্নের মুখোমুখি হলো অমিত।
'এ কেমন হলো, তুমি যেমন করে গাইছো, স্বরলিপিতে ঠিক সে রকম তো দেখছি না।'
অমিত বললো, 'শান্তি নিকেতনে গানটি ওভাবেই শেখানো হয় এবং গুরুমুখী শিক্ষায় সেখানে ওই রকমই পেয়েছে সে।'
সাধন দা বললেন, 'ঠিক আছে, স্বরলিপিও সেইভাবে লেখানো উচিত ছিল। সকলের জন্য স্বরলিপি হবে এক রকম, আর শান্তি নিকেতনের বিশেষ শিক্ষা হবে অন্য রকম, তাতো হতে পারে না।'

সাধন দা'র যুক্তি মানতেই হলো। স্বরলিপিকেই ধরে নেওয়া হলো সঠিক। সাধন দা জানতেন, স্বরলিপির পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ অনুসরণ হলেও গানে ঠিক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। স্বরলিপি গানের কাঠামো মাত্র। তবুও এই কাঠামোকে সঠিকভাবে দাঁড় করাবার কথাই তিনি বলতেন। টপ্পা শ্রেণীর গানে কণ্ঠের ছোটো ছোটো কাজের স্বরলিপির বিচ্যুতি হলেই তাঁর অনুযোগ শোনা যেতো- 'উঁহু, উঁহু ঠিক হলো না।' স্বরলিপি তাঁর হাতে দিয়ে বলেছি- 'গানটির সুর কেমন হবে, সাধন দা?' দু'একবার মৃদু কণ্ঠে সরগম করেই সাধন দা গানটি স্বরলিপি দেখে গেয়ে ফেলতেন। কতদিন অবাক হয়ে বলেছি- 'আচ্ছা সাধন দা, আপনার দু চোখ কি ভার্টিকালি চলতে চলতে সামনে এগোয়, নইলে একই সঙ্গে গানের বাণী আর স্বরলিপি কিভাবে এত দ্রুত দেখতে পান?' কোনো ঘরোয়া বৈঠকে কোনো বিশেষ রবীন্দ্র সঙ্গীতের ফরমাশ করলেই সাধন দা বলতেন- 'কোনো গানই তো মনে থাকেনা, স্বরলিপি থাকে তো দাও। গাইতে চেষ্টা করি।' স্বরলিপির ব্যাপারে সাধন দা'র এই দক্ষতা লক্ষ্য করেই বোধ হয় রবীন্দ্র সঙ্গীত স্বরলিপিকার শৈলজারঞ্জন মজুমদার তাঁকে বলেছিলেন, 'সাধন, আমার প্রথম জীবনে তোমার মতো কাইকে যদি আমার পাশে পেতাম।' সাধন দা যে তাঁর একলব্য তা কি আর তিনি জানতেন। শৈলজারঞ্জন যে ক'দিন খুলনায় ছিলেন, সাধন দা তাঁর পাশে পাশে ছিলেন একজন শিষ্যের মতো, একজন শিশুর মতো। খুলনার মতো একটি শহরে সাধন দা'র মতো কোনো গুণীর সাক্ষাৎ শৈলজারঞ্জন কল্পনাও করেন নি। সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় সাংগীতিক ভাষা ও ব্যাকরণ এতখানি আয়ত্তে আনায় সাধন দা হয়তো তাঁর বিস্ময়বালক প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন।

এমন অবাক অবশ্য আরো কোনো কোনো গুণী হয়েছেন। সালামত-নাজাকাত ভ্রাতৃদ্বয় এলেন খুলনায়। সন্দীপনের এক সংবর্ধনায় ইমন গাইলো খুদে শিল্পী নাসিমা। গান শেষ হলে বিশ্রুত ওস্তাদ জিজ্ঞেস করলেন- 'ওস্তাদ কৌন?' সাধন দা'র প্রতি ইঙ্গিত করলেন কেউ। ওস্তাদ উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন কোলাকুলির জন্য। এমন পুরস্কার ক'জন পায়। একবার সন্দীপনে এলেন এক বিখ্যাত ব্যক্তি- কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ। সন্দীপনের কয়েকটি গান তাঁকে এমনই মুগ্ধ করলো যে তাঁর সংবর্ধনা শেষে বারবার শুনলেন সাধন দা'র কণ্ঠে সেই গান। এই গানের সুবাদে আমার মতো সাধারণ এক গীতিকারের সাথে কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ'র দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগের সূত্রপাত হলো।কবি যখনই ঢাকায় এসেছেন, পূর্বাণী হোটেল থেকে টেলিফোন পেয়েছি- 'আপ ক্যায়সে হ্যায়? ওস্তাদজি ক্যায়সে হ্যায়?'

মধ্যষাটে কবি সুফিয়া কামাল'র নেতৃত্বে ছায়ানট'র শিল্পীরা এলেন খুলনায় ষাটগম্বুজসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থান দর্শনে। সন্দীপনের সঙ্গে ছায়ানট'র আড্ডা জমলো। সাধন দা'র সুর তাঁদের মন কাড়লো দারুণ। বিশেষ করে আবুবকর সিদ্দিক'র 'বেরিকেড বেয়নেট বেড়াজাল...' বোধহয় শ্রবণ মাত্র তাঁদের রপ্ত হয়ে গেল। মুক্তিযুদ্ধেও তাঁদের কেউ কেউ এই গান কণ্ঠে তুলে নেন। এই গানের এমন সহজ অথচ অগ্নিগর্ভ শক্তিছিলো যে, আমরা যতবারই সমবেত কণ্ঠে এই গানটি গেয়েছি, প্রত্যেকবারই রক্তে উত্তেজনা অনুভব করেছি। আমার লেখা গানের চাইতে এই গানটি আমার বেশি পছন্দ ছিল বরাবর। মনে মনে ভাবতাম, আমার কোনো গানে সাধন দা এমন জোরালো সুর দেননি, যদিও সে কথা বললে সাধন দা স্বীকার করতেন না। আসলে এই গানটির রচনার মধ্যেই সরল অথচ উত্তেজনাময় এক টগবগে স্পীড আছে। মনের সমস্ত আবেগ ঢেলে গলা ফাটিয়ে গাওয়ার মতো একটি রচনা ও সুর এই 'বেরিকেড বেয়নেট বেড়াজাল।'

আরো একটি ঘটনা। ১৯৭৩ খ্রিঃ-এ একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে খুলনায় গাড়ী পাঠিয়ে সাধন দা'কে ভাইস চ্যান্সেলর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নেন। শহীদ মিনারে মধ্য রজনীর অনুষ্ঠানে জীবনানন্দ'র একটি কবিতা সাধন দা গাইলেন তাঁরই সুরে। ভাইস চ্যান্সেলর খান সারওয়ার মুরশিদ তন্ময় হয়ে গানটি শুনে আমাকে বললেন- 'শিল্পীকে কত সম্মানী দিচ্ছো?'
'পাঁচ হাজার টাকা'- বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বললাম আমি।
ভাইস চ্যান্সেলর খান সারওয়ার মুরশিদ বললেন- 'ওটা ডবল করে দাও- দশ হাজার। আমি অনুমোদন দেবো।' এত ভালো লাগলো আমার। গুণীকে চেনাও তো মহৎ গুণ।

সাধন দা'র সুর রচনা যে আভিনব, ব্যতিক্রমী ও বাজারলাভে সক্ষম এ সম্পর্কে সুরকারও সচেতন ছিলেন। কিন্তু এই সুরকে পণ্য করে তাঁকে বাজারমুখী করা গেল না। আধুনিক প্রেমের গানে তার আশ্চর্য সুর সাধারণ্যে অশ্রুত থেকে গেল। ষাট দশকের গোড়ায় তাঁকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে আমি ঢাকায় নিয়ে যাই এবং সেখানে মুস্তফা (অভিনেতা) ও আমি মিলে মতিঝিলের এক রেকর্ড কোম্পানীর অফিসে তাঁকে হাজির করাই। অবাঙালি কর্মকর্তা তাঁরই সুরে তাঁর কণ্ঠে আধুনিক গান শুনে বললেন- প্রত্যেকটি গানই হিট হবে। সাধন দা'কে কবে তাঁর কাছে আবার আসতে হবে, তাও স্থির করলেন। ব্যাস ওই পর্যন্ত। ঢাকা থেকে পালিয়ে যেন সাধন দা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আর কোনোদিন তিনি রেকর্ড কোম্পানী মুখো হন নি। অবশ্য যখন সাম্প্রতিককালে ক্যাসেট গান রেকর্ড করার চল হলো, তখন তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছেন চেতনার সৈকত'র গান রেকর্ড করায়। তাও ঠিক তাঁর কোনো ব্যক্তিগত খ্যাতির জন্য নয়। এ সময়ে তিনি চলাফেরা করতে পারেন না, শুয়েই থাকেন। সকালের রোদে বাড়ীর ভিতরে বারান্দায় কিছুক্ষণ বসেন। প্রায় শেষ পর্যায়ে সব রকম চিকিৎসা। কথা প্রসঙ্গে আমি বললাম, তাঁর সুরে বাঁধা গানগুলি এখনও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিপুল উৎসাহে গেয়ে থাকে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী লাইসা আহমদ লিসা ও তার অগ্রজ ইমতিয়াজ আহমদ আমার সঙ্গে ছিল। ওরা দু'জনে দু'তিনটি গান গেয়েও শোনালো। সাধন দা সে গান শুনে একটু খুশি হয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'আজ প্রায় তিরিশ বছর পরও গানগুলি চলছে, সকলের ভালো লাগছে। কি আশ্চর্য! অথচ যখন এই সুর করা হয়; তখন অনেকে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে সুর গুলি একটু নরম এবং বেশি গরম হলে আরো ভালো হতো।' আমি বুঝতে পারলাম, ১৯৬৮ খ্রিঃ-এ ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন-এ অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় ফেষ্টিভ্যালে সন্দীপনের গান শোনার পর কোনো কোনো বিদগ্ধ ব্যক্তির সমালোচনা তার এখনও মনে আছে, যদিও ওই সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ভাষ্য ছিল দারুণ প্রশংসামুখর। বিশেষ করে লাহোর পাকিস্তান টাইমস-এর বিশাল প্রতিবেদনে বলা হয় যে গানগুলি শ্রোতৃমন্ডলীর মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার করে। কেউ সাধন দা'র গানের প্রশংসা করলে তার এক গাল হাসিমুখ আমরা দেখেছি। কিন্তু কেউ তাঁকে অশ্রদ্ধা করলে কখনও তাঁর বিরূপ চেহারা আমরা দেখিনি। হয়তো যিনি তাঁর সাথে এমন ব্যবহার করতেন, তাকে তখন তিনি করুণাই করতেন। খুলনায় হাসান আজিজুল হকের বাড়িতে এক ঘরোয়া বৈঠকে কোনো এক প্রসঙ্গে সাধন দা তখন সদ্য প্রকাশিত শচীন দেব বর্মণের একটি লং প্লে'র উচ্ছসিত প্রশংসা করায় একজন তরুণ শিল্পী খুব অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠে- 'শচীন দেব বর্মণ'র ওগুলো কি গান হয়েছে? ওগুলো গান? আমি একজন রেডিও আর্টিস্ট, আমি তো জানি ওগুলো আদৌ গান হয়েছে কিনা।' এই তরুণ শিল্পী বর্তমান বাংলাদেশে আধুনিক গানের ক্ষেত্রে একজন পরিচিত ব্যক্তি। সাধন দা'র সাথে তার কোনো পূর্ব পরিচয় ছিল না এবং ওই সময়ে তিনি আমার সাথে খুলনায় বেড়াতে যান। খুলনায় তখন রেডিও স্টেশন স্থাপিত না হওয়ায় সধন দা রেডিও আর্টিস্ট হবার মর্যাদাও লাভ করেন নি। সুতরাং তরুণ শিল্পী সে বিষয়েও বেশ সচেতন ছিলেন। তরুণ শিল্পীর কথা শুনে আমরা স্তম্ভিত। সাধন দা'র সাথে তার এই আচরণে দারুণ মর্মাহত আমরা। সাধন দা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন- 'ওগুলো গান না?' সেই তরুণ শিল্পী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রেডিওতে একটু আধটু আধুনিক গান করতেন। তিনি বেশ উত্তেজিত হয়েই বললেন, 'পুরাতন কিছু শুনলেই আমরা আহা মরি আহা মরি করি। ও গুলো গান। ছিঃ'- তরুণ শিল্পীর আক্রমনাত্মক মনোভাব ও কথাবার্তা সত্ত্বেও সাধন দা খুব শান্ত কণ্ঠে বললেন- 'ঠুমরী যদি গান না হয়, ঠুমরীর আবেদন যদি এখন ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই ওগুলো গান নয়।' এই কথা বলে সাধন দা এই প্রসঙ্গের ইতি টেনে হাসান অগ্রজা অধ্যাপিকা জাহানারা'কে বললেন- 'দ্যান, একটা পান দ্যান, খেয়ে যাই, আমার একটু কাজ আছে।' সাধন দা চলে গেলেন। যেহেতু ওই তরুণ শিল্পী আমারই অতিথি এবং আমিই সেখানে তাকে নিয়ে গেছি, তার এই আচরণে আমি লজ্জায় মাটিতে মিশে গেছি। কারো দিকে আমি তাকাতে পারছি না। বৈঠক আর জমলো না। সেই তরুণ শিল্পী আরো কিছুক্ষণ একা একা গজগজ করে তার বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণ করতে চাইলেন। কেউ আর সে কথায় কান না দিয়ে যে যার মতো উঠে পরলেন। এই অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য সাধন

দা'র কাছে আমি যখনই ক্ষমা চেয়ে বলেছি, এমন একজনকে সেখানে নেওয়া আমার ভুল হয়ে গেছে, সাধন দা আমাকে উল্টো সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন- 'আরে ওসব নিয়ে ভাবো কেন? ও ছেলেটি না বুঝেই ও রকম বলেছে।' চালিয়াতি দেখাবার দরকার কখনও সাধন দা'র পড়েনি। তাই কোন শিল্পীর চালবাজি দেখলেও কিছু বলতেন না। এমন কি শ্রোতার মনোযোগ কম দেখলেও তা নিয়ে অভিযোগ ছিল না তাঁর।

একবার কয়েকজন শিল্পীসহ সাধন দা ও আমি সন্দীপনের পৃষ্ঠপোষক জেলার এক বড় কর্মকর্তার বাসায় গান শোনাতে যাই। খুলনা বিভাগের উচ্চপদস্থ আমলাগণ সেখানে সমবেত। গানের আসরের পর ডিনার। গান শুরু হবার পর সাধন দা বুঝতে পারলেন সবাই খুব নিচু স্বরে পরস্পর তাদের বৈষয়িক চাকরী সংক্রান্ত কথাবার্তা বলছেন, কেউ গান শুনছেন না, কিন্তু এক একটি গান শেষ হবার সাথে সাথে যন্ত্রচালিতের মতো করতালি দিচ্ছেন। আসরের এক ফাঁকে সাধন দা আমাকে বললেন- 'কেউ যে গান শুনছে না, তার একটা প্রমাণ দেব, দেখবে?' হারমোনিয়াম টেনে সাধন দা গাইতে শুরু করলেন- 'সকরুণ বেনু বাজায়ে।' বার দুয়েক গানের মুখটা গেয়ে তিনি এমনভাবে ধীরে ধীরে গানটিকে ফেড আউট করলেন যেন গান শেষ হলো। যথারীতি করতালি। কেউ বললো না, কই গানটিতো শেষ করলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন সাধন দা। যেখানে গান শোনায় শ্রোতার আগ্রহ নেই, সেখানে তিনি দায়সারাভাবে গান গাইতেন। শ্রোতাকে জবরদস্তি গান শোনাবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। ঠিক একইভাবে যে ছাত্র-ছাত্রী সঙ্গীত শিক্ষায় সত্যিকার আগ্রহী, তাঁকে প্রাণ উজার করে গান শেখাতেন। সঙ্গীত শিক্ষা যেখানে পারিবারিক ফ্যাশন কিংবা কোন সীমিত লক্ষ্যে- সেখানে গান শেখাবার বেলায় তিনি মোটেই সিরিয়াস হতে পারতেন না। এ কথা আজ এ জন্যই বলছি, কারো কারো অভিযোগ আমি শুনেছি। তারা বলতেন- 'সাধন দা'র এত বড় ভান্ডার অথচ শিক্ষার্থীকে দেবার বেলায় তিনি কৃপণ। অথচ নিঃস্বার্থভাবে, এমন কি মাসিক পারিশ্রমিকের বিনিময়েও নয়, শুধুমাত্র মনের আনন্দে খুলনা শহরের কত গুণী শিল্পীকে তিনি বিদ্যাদানে ব্রতী ও নিরলস ছিলেন, এমন সাক্ষীও আছেন অনেকে।

স্বদেশ ছেড়ে যাবার কথা কখনও ভাবেননি সাধন দা। সাতচল্লিশে উপমহাদেশ ভাগ হয়ে যাবার পর খুলনা শহর উজার হয়ে গেল। কত ধনী-নির্ধন পরিবার চলে গেল ভারতে। এক বিধাব মাকে নিয়ে দেশত্যাগ কত সহজ ছিল তাঁর জন্য। তিনি যান নি। নিঃসঙ্গ ও নির্বান্ধব হয়ে গেছেন, তবুও দেশের মাটি আঁকড়ে থেকেছেন। সেই সময়ে যখন দ্বিজাতিতত্ত্ব একেবারে তুঙ্গে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে কলকাতা-বিহার-নোয়াখালী আচ্ছন্ন, তখন পিতৃহারা একটি হিন্দু বালকের এখানে টিকে থাকা যে কত কঠিন ছিল, এখন তা অনুমান করা যাবে না। এই রকম এক অনিশ্চিত জীবনের মাঝে, যখন তাঁর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে, কোনো আশ্রয় নেই তাঁর, তখন সঙ্গীসাথীর অভাবে খেলার মাঠ ছেড়ে একটি বাঁশের বাঁশি তুলে সুরের ভুবনে পা বাড়ালেন তিনি। এই রকম পা ফেলায় কোনো প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি তখন মোটেই ছিল না। তাছাড়া সেই অর্থে সঙ্গীতকার হিসাবে প্রতিষ্ঠার কথা কি কখনো ভেবেছেন? তবে কেন খেলার মাঠ ছেড়ে বাঁশি ধরলেন? শুধু কি বন্ধুহীন অবসর কাটাবার জন্য? এত বড় বিরল সুর সাগরের রক্তে সুরের ঢেউ তখন অন্তর্লীন ছিল, এমন কথা কেমন করে বলি। আর সুরের ভুবনে প্রবেশ করতেই সাধন দা বুঝলেন তাঁর ঔশ্বর্য, তাঁর প্রতিভা। এই আবিষ্কার, এই উপলব্ধি তাঁর চরিত্রে এক ধরণের আত্মবিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। অগ্রণী শিল্পী সংঘে তাঁর যোগাযোগ ওই সময়ে একটি সঠিক পদক্ষেপ। পাকিস্তান পত্তনের পর পরই ইসলামী তমুদ্দুন ও তাহজীব নেশামুখ এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব সম্পর্কে নির্লিপ্ত ধর্মনিরপেক্ষ চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতিচর্চার প্রতি এই সংগঠনের পূর্ণ আত্মনিয়োগ এখন আমাকে খুবই অবাক করে। তখনও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দানা বাঁধেনি। কিন্তু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে খুলনায়। জাহিদুল হক (সাংবাদিক, ডন/পরবর্তী কালে বেজিং প্রবাসী) ও শামসুল হুদা (প্রয়াত, অধ্যাপক পশ্চিম পাকিস্তান) ছিলেন এই সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি। শামসুল হুদার গোটা পরিবার'র এ কে এম মুসা (অবসরপ্রাপ্ত সি এস পি), গোলাম মুস্তফা (অভিনেতা), রিজিয়া সুলতানা ও আবু আবদুল্লাহ (অর্থনীতিবিদ) সবাই যুক্ত ছিলেন এই সংগঠনের কর্মকান্ডে। শামসুল হুদা'র বন্ধু আনোয়ার হোসেনও (তেভাগা আন্দোলনে রাজশাহী জেল খাপড়া ওয়ার্ডে নিহত) এই সংগঠনে আসতেন। সুতরাং জীবনের প্রথম থেকেই সাধন দা প্রগতিশীল স্রোতোধারায় যুক্ত। এই প্রবাহ চ্যুত হন নি তিনি কোনোদিন। নিদারুণ দারিদ্রে জীবন ধারণ যখন দুঃসাধ্য হয়েছে, অথচ রুচি ও নীতির প্রশ্নে একটুখানি আপোষ অনেক প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা, তখনও সাধন দা তাঁর আদর্শভ্রষ্ট হননি। চারদিকের বিপরীত হাওয়া ঠেকিয়ে আপন বিশ্বাস ও রুচিবোধের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়নি। তবুও সাধন দা'কে সেভাবে থাকতে দেখা গেছে। আদর্শ, রুচি এসব তাঁর এক সহজাত ব্যাপার স্যাপার। কোনো অঙ্ক কষে জীবনের ধ্রুবক নির্দিষ্ট করেন নি তিনি। তাঁর সব অর্জনই তাঁর ভিতরে এক হয়ে মিশে গেছে। যে আলো তিনি পেয়েছেন নানাভাবে, সেই আলো থেকে তাঁকে পৃথক করা যায় না। কোনো আদর্শের তিলক ললাটে এঁকে বাহাবা পাবার কোনো মতলব সেখানে নেই। পাদপ্রদীপের সামনে, কি নেপথ্যে, কোনো অবস্থায়ই এই আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে কোনো বাগাড়ম্বও তাঁর ছিলনা। তিনি চলতেন তাঁর মতো।

সাধন দা'র মৃত্যুর পর পাঁচ বছর পুরো হলো গত মাসে। এভাবে কত বছর যাবে নিরবধি কালের স্রোতে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি এখন রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করেছে। এখনও কি আমরা একটি সংগ্রামী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে একুশে পদক (মরণোত্তর) দেবার কথা ভাবতে পারি না? এখনও কি তাঁর বিপুল সুরারোপের সামান্য যেটুকু স্বরলিপিবদ্ধ, তার সংগ্রহ ও প্রকাশনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁর কৃতির স্বাক্ষর রেখে যেতে পারি না?

[নাজিম মাহমুদ স্মারক গ্রন্থ ঃ 'একটি পদধ্বনি হাজার হয়ে বাজে' থেকে সংগৃহীত]

---সমাপ্ত---